

Pandemic and Bengali Literature: Tales of Exclusion and Care

মহামারি ও বাংলা সাহিত্য: বর্জন ও সেবার আখ্যান

Dr. Nayan Sarkar
Independent Researcher
Kalyani
West Bengal

Received on: 21st April 2026
Accepted on: 04th May 2026

Abstract:

This article provides a comparative discussion of the multifaceted impact of epidemics (primarily cholera or smallpox) and their literary consequences in 19th and 20th century Bengali narrative literature. Disease is not just a biological problem, but how it is dissected through network structures, caste, and psychological relationships is the main exploration in this study. The first part of the article analyzes the form of social isolation and patient untouchability described in Sharat Chandra Chattopadhyay's novel 'Srikanta' in the light of Michel Foucault's 'Biopolitics'. In the second stage, the epistemological conflict between traditional worldly wisdom and modern Western medical science is highlighted through Tarashankar Banerjee's 'Arogya Niketan'. In the next section, the realistic writings of Jagadish Gupta and Manik Banerjee identify the horrific nature of the pandemic and the trend of aesthetic change. A special aspect of the research is the discussion of the pandemic in the light of Dalit literature and Matua philosophy. It discusses in detail how an alternative narrative of service has emerged against the politics of exclusion through the humanist ideals of Sri Sri Harichand and Guruchand Thakur and the collective care of the Malo community of Advaita Mallavarman. Ultimately, the article concludes by examining how these literary narratives can still serve as our social and psychological guide in the context of the contemporary global pandemic.

Key Words:

Pandemic, Bengali Literature, Biopolitics, Social Isolation, Dalit Literature, Matua Philosophy, Nursing

মূল প্রবন্ধ

সাহিত্যের মৌল উপজীব্য মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম। তবে এই সংগ্রামের অভিব্যক্তি যখন কোনো অতিমারি বা মড়কের অভিঘাতে প্রকল্পিত হয়, তখন তা কেবল একটি শারীরিক বিকার বা জৈবিক বিপর্যয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে সমাজ-মানুষের ব্যবচ্ছেদকারী এক অমোঘ দর্পণ। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার সমাজ-বাস্তবতায় 'কলেরা' বা 'ওলাউঠা' কেবল এক

মরণঘাতী ব্যাধি ছিল না, তা ছিল একাধারে ভীতি, লৌকিক সংস্কার এবং সামাজিক বিন্যাসের এক তীব্র পরীক্ষা। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বাংলা আখ্যান-সাহিত্যের সেই গহন প্রদেশে প্রবেশ করার প্রয়াস পাব, যেখানে মহামারি মানুষের ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিলীন করে দেয় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক প্রাচীর গড়ে তোলে। ব্যাধি ও মানুষের এই দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের দিকপালগণ যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী যে বৈচিত্র্যময় বয়ান তৈরি করেছে, তা বিশ্বসাহিত্যের নিরিখেও অনন্য। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে মহামারি যেখানে সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ ও অস্পৃশ্যতার রূপক হয়ে ধরা দিয়েছে, তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’ এ তা-ই আবার প্রাচীন আর্য-বিবেচনা ও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার সংঘাত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ বিভূতিভূষণ বা জগদীশ গুপ্তের রচনায় এই ব্যাধিই আবার কখনো নিসর্গের নির্মমতা, কখনো বা মানুষের প্রবৃত্তিগত নগ্নতাকে অনাবৃত করেছে।

এই আলোচনার এক অপরিহার্য স্তম্ভ হলো মতুয়া আন্দোলন। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত দর্শন ব্যাধিকে দেখার চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিকে আমূল বদলে দিয়েছিল। যে সময় তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ সংক্রমণের ভয়ে আক্রান্ত মানুষকে ‘অস্পৃশ্য’ জ্ঞানে শ্মশানের ধারে পরিত্যাগ করত, সেই ক্রান্তিকালে মতুয়া আন্দোলন ‘জীবে দয়া’ এবং ‘হাতে কাম মুখে নাম’ এর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এক বৈপ্লবিক সেবামূলক আখ্যান গড়ে তোলে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা ছিল — আত্মের সেবা কোনো নিছক দয়া নয়, বরং ঈশ্বর লাভের পরম পথ। তাঁদের এই ‘মানবতাবাদী ধর্মতত্ত্ব’ মহামারির সংকটে এক নতুন সামাজিক ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল, যা জাত-পাতহীন এক সমান্তরাল শূশ্রূষার সংস্কৃতি নির্মাণ করে। তবে এই গবেষণার একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অপরিহার্য দিক হলো প্রান্তিক বা দলিত জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের মূলধারার পাশাপাশি অদ্বৈত মল্লবর্মণ বা তৎপরবর্তী দলিত সাহিত্যের আখ্যানে ব্যাধির যে রূপ দেখি, তা আমাদের প্রচলিত ‘শূশ্রূষা’ বা ‘সেবা’র ধারণাটিকে আমূল বদলে দেয়। উচ্চবর্ণের শুচিবায়ুগ্রস্ততা যখন রোগীকে বর্জন করে, তখন ব্রাত্যজনের সামষ্টিক প্রতিরোধ এবং লৌকিক সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা কীভাবে এক বিকল্প জীবনদর্শনের জন্ম দেয় — তা এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অন্বেষণ। এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় কেবল অতীতের এক ব্যাধিবন্টনচিত্র অঙ্কন করা নয়, বরং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের সেই ধারাটিকে চিহ্নিত করা যা সমকালীন বিশ্ব-মহামারির প্রেক্ষাপটেও সমান প্রাসঙ্গিক। ‘মেডিক্যাল হিউম্যানিটিজ’ এর তাত্ত্বিক আলোকে আমরা বিশ্লেষণ করব — কীভাবে একটি জীবাণু সমাজদেহের অদৃশ্য ক্ষতগুলিকে অনাবৃত করে দেয় এবং কীভাবে চরম বিপন্নতার লগ্নেও মানুষের শূশ্রূষা-প্রয়াস এক নতুনতর মানবতার ভাষ্য রচনা করে। এই নিরন্তর বিবর্তনধারাটি অনুধাবনের মাধ্যমেই বর্তমান গবেষণার সাধকতা নিহিত।

ব্যাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক ঘৃণা এবং বর্জনের এক নির্মোহ ইতিহাস আমরা দেখতে পাই। এখানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধারার আখ্যানের মধ্য দিয়ে এই ‘নির্বাসন’ প্রক্রিয়াটিকে ব্যবচ্ছেদ করব। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে শ্রীকান্তের মেজদা কোনো কাল্পনিক চরিত্র নন, তিনি হলেন তৎকালীন ‘ভদ্রলোক’ সমাজের ভীতি ও সংকীর্ণতার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। শ্রীকান্ত যখন মুমূর্ষু, তখন মেজদার উক্তিটি কেবল সাবধানতা নয়, বরং এক প্রকার ‘জৈব-আগ্রাসন’। “মেজদা দরজার কপাটটা অল্প ফাঁক করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নাকে চাদর চাপিয়া ধরিতে ধরিতে বলিলেন — শ্রীকান্তকে আর এক মুহূর্ত এখানে রাখা চলিবে না। ওলাউঠা ব্যাধি নয়, এ যেন রাক্ষসী। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেগুলোকে যমদূতের হাতে তুলিয়া দিতে পারি না। আজই ওকে শ্মশানের ধারের ওই পোড়ো ঘরটায় সরাইয়া ফেলার বন্দোবস্ত করো। ওখানেই ওর যা হওয়ার হইবে।”^১ এখানে ‘যমদূত’ এবং ‘রাক্ষসী’ শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেজদার কাছে শ্রীকান্ত তখন আর ছোটো ভাই নন, তিনি এক ‘সংক্রমণের আধার’। মিশেল ফুকোর ‘বায়োপলিটিক্স’ তত্ত্বের আলোকে দেখলে বোঝা যায়, মেজদা এখানে রাষ্ট্র বা সমাজের সেই ক্ষমতার প্রতিনিধি, যারা জনসমষ্টির স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে একজন ব্যক্তির ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা কেড়ে নেয়। ‘শ্মশানের ধারের পোড়ো ঘর’ মূলত একটি সীমারেখা — যা গ্রাম (জীবন) এবং শ্মশানের (মৃত্যু) মাঝখানে অবস্থিত। সমাজ এখানে রোগীকে জীবন্ত অবস্থাতেই মৃত বলে ঘোষণা করে।

শ্রীকান্ত যখন সমাজচ্যুত হয়ে শ্মশানের ধারে পড়ে আছেন, তখন রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব সেই ‘জৈব-ক্ষমতা’ বা বায়োপ্যাওয়ারের

বিরুদ্ধে এক প্রবল চপেটাঘাত। “রাজলক্ষ্মী আমার মস্তকটি নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মৃদুস্বরে কহিল — ‘যাদের তুমি আপন ভাবিয়াছিলে শ্রীকান্ত, তারা তোমাকে এই শ্মশানের পঙ্কিলতায় বিসর্জন দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অস্পৃশ্য নারীর নিকট তুমি এখনো মানুষ। জগতের কাছে আমি পতিতা হইতে পারি, কিন্তু এই ব্যাধির সেবাতেই আমার পরম মুক্তি।’ সে নিজের আঁচল দিয়া আমার গাত্রের ঘাম ও ক্লেদ মুছাইয়া দিল।”^{২২} এখানে রাজলক্ষ্মীর সেবা কেবল শারীরিক শুশ্রূষা নয়, এটি একটি ‘Counter-Discourse’। সমাজ যাকে ‘পবিত্র’ মনে করে (মেজদা), সে পলায়নপর; আর সমাজ যাকে ‘অশুদ্ধ্য’ বা ‘অস্পৃশ্য’ মনে করে (রাজলক্ষ্মী), সে-ই পরম মমতায় রোগীর ‘ক্লেদ’ মুছিয়ে দিচ্ছে। গবেষকের দৃষ্টিতে এটি এক প্রকার ‘Subaltern Agency’। রাজলক্ষ্মী এখানে প্রমাণ করছেন যে, মহামারি আসলে সমাজের ভণ্ডামি ও নীতিহীনতাকে অনাবৃত করে দেয়। শুশ্রূষা এখানে সেবার গণ্ডি পেরিয়ে এক রাজনৈতিক প্রতিবাদে রূপ নেয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে ব্যাধিকে দেখেছেন প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য এবং নির্লিপ্ত অংশ হিসেবে। তাঁর বর্ণনায় সামাজিক বিচ্ছেদ কোনো শোরগোল তোলে না, বরং তা এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় ধরা দেয়। “গ্রামের শেষ প্রান্তে হরিহরের ভিটায় তখন নিবিড় অন্ধকার। কলেরার মড়কে পাড়াটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। দুর্গা যখন ত্রয়ায় বুক ফাটিয়া ‘জল জল’ করিয়া চিৎকার করিতেছিল, তখন পাশের ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া কেহ আগাইয়া আসিল না। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে আদিম অবিশ্বাস, তাহা ব্যাধির চেয়েও অধিক সংক্রামক হইয়া গ্রামখানিকে গিলিয়া খাইতেছে।”^{২৩} এখানে ‘মানুষের প্রতি মানুষের আদিম অবিশ্বাস’ বাক্যটি গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। বিভূতিভূষণ এখানে দেখিয়েছেন যে, মহামারি কেবল শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে না, বরং মানুষের ‘সহমর্মিতা’ নামক বোধটিকেও হত্যা করে। ফুকোর তত্ত্ব অনুযায়ী, এটি হলো ‘Modernity’s Failure’ — যেখানে সভ্যতার দাবিদার মানুষ সংকটের মুহূর্তে আদিম পশুর মতো আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নকরণ কেবল বাহ্যিক নয়, বরং তা মনস্তাত্ত্বিক।

আবার সমাজতাত্ত্বিক ভাবে দেখলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীকান্ত যখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মূর্খ অবস্থায় একটি মেসে পড়ে ছিলেন, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও মেজদার আচরণটি লক্ষ্য করার মতো। শরৎচন্দ্র এখানে কোনো রাখঢাক না রেখে সমাজের সেই ‘মড়ক-মনস্তত্ত্ব’কে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীকান্তের মেজদা যখন জানতে পারেন যে বাড়িতে একজনের ওলাউঠা (কলেরা) হয়েছে, তখন তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল আতঙ্ক এবং পলায়নপরতা। তিনি শ্রীকান্তের সেবা করা তো দূরের কথা, বরং রোগীকে বাড়িতে রাখা হবে কি-না তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। এখানে ব্যাধিটি জৈবিক সীমা অতিক্রম করে একটি ‘সামাজিক কলঙ্ক’ বা স্টিগমায় পরিণত হয়। গবেষক হিসেবে আমাদের চোখে পড়বে, শরৎচন্দ্র এখানে সুকৌশলে দেখিয়েছেন যে, হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ‘শুচিবায়ু’ কীভাবে মহামারির সময় নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হয়। রাজলক্ষ্মী যখন এসে শ্রীকান্তের সেবার গ্রহণ করেন, তখন তিনি কেবল একজন সেবিকা নন, বরং সামাজিক সংস্কারের উর্ধ্বে এক ‘মানবিক অতিমানব’। ১৯ ও ২০ শতকের বাংলা আখ্যানে প্রায়শই দেখা যায়, মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রাম থেকে দূরে একটি পরিত্যক্ত কুঁড়েঘর বা নদীর চরে একা ফেলে রাখা হতো। এটি ছিল এক প্রকার ‘জীবিতাবস্থায় শ্মশানবাস’। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ বা তারাজঙ্করের ‘গণদেবতা’য় দেখা যায়, গ্রামকে রক্ষা করার দোহাই দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নকরণকে বর্তমানের পরিভাষায় ‘কোয়ারেন্টাইন’ বলা গেলেও, তৎকালীন সময়ে এর চরিত্র ছিল ধর্মীয় এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। গবেষকের ভাষায় একে বলা যেতে পারে ধর্মীয় অনুশাসন-ভিত্তিক নির্বাসন। এখানে বিজ্ঞান নয়, বরং ভীতিই ছিল চালিকাশক্তি। এখানে একটি বৈপ্লবিক দিক হলো এটি দেখানো যে- কারা আসলে সেবা করছে? আখ্যানগুলিতে দেখা যায়, যারা সমাজের চোখে ‘পতিতা’, ‘ব্রাত্য’ বা ‘নিচু জাতের’, তারাই সংকটের সময় প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছে। রাজলক্ষ্মী (যাকে সমাজ ভালো চোখে দেখত না) বা তারাজঙ্করের গল্পের সেই ডোম বা কাহার ঘরের নারীরাই কিন্তু মরণজয়ী সেবায় অবতীর্ণ হয়। এখানে একটি চমৎকার প্যারাডক্স বা বৈপরীত্য কাজ করে। সমাজ যাদের ‘অস্পৃশ্য’ বা ‘অশুদ্ধ্য’ বলে দূরে সরিয়ে রাখে, মহামারির চরম মুহূর্তে তারাই হয়ে ওঠে একমাত্র ‘শুদ্ধ্য’ সেবাকারী। কলেরা রোগীর মনস্তত্ত্বে সবচেয়ে বড়ো আঘাত হলো তাঁর ‘অপরিচয়’। যখন কেউ পাশে থাকে না, তখন মানুষ কেবল শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগে না, বরং অস্তিত্বের সংকটে

পড়ে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে আমরা দেখি, রোগী যখন বুঝতে পারে তাকে ফেলে যাওয়া হয়েছে, তখন তার মনের ভেতরে সমাজের প্রতি এক প্রকার ঘৃণা ও তীব্র ক্রোধ তৈরি হয়। এই মৃত্যুপথযাত্রীর মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত নির্মোহভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এই সময় অর্থাৎ উনিশ ও বিশ শতকের গ্রামীণ বাংলা এক ঐতিহাসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে ছিল পুরুষানুক্রমিক লৌকিক বিশ্বাস ও আয়ুর্বেদীয় প্রজ্ঞা, অন্যদিকে ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ‘অ্যালোপ্যাথি’ ও তার যান্ত্রিক নিদান। এই দ্বৈরথটি কেবল দুটি চিকিৎসা পদ্ধতির সংঘাত নয়, বরং এটি ছিল একটি জাতির ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠার যন্ত্রণাদায়ক প্রসববেদনা। তারাজঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরোগ্য নিকেতন’ এই আলোচনার মধ্যে অন্যতম। জীবন মকিম এখানে কেবল একজন কবিরাজ নন, তিনি এক ক্ষীয়মাণ ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। অন্যদিকে নবীন ডাক্তার প্রদ্যোত হলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মূর্ত প্রতীক। “জীবন মকিম নাড়ী ছাড়িয়া দিয়া গভীর স্বরে কহিলেন — ‘বাবা প্রদ্যোত, তোমার ওই কাঁচের নল আর স্টিল-সূঁচ দিয়া ব্যাধির যমকে আটকানো চলবে না। নাড়ী কহিতেছে, যমের পরোয়ানা আসিয়া গিয়াছে। শরীর তো কেবল মাটির তাল নয়, ও যে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। প্রকৃতির নিয়মে যখন বিষ হানা দেয়, তখন তাকে ইনজেকশন দিয়া বাধা দিলে যন্ত্রণাই বাড়ে, মুক্তি মেলে না।”^{৪৪} এখানে ‘নাড়ী’ হলো মরমী অভিজ্ঞতাবাদ, যা রোগীর শরীরের সঙ্গে চিকিৎসকের এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে। জীবন মকিমের কাছে রোগ হলো ‘প্রকৃতির নিয়ম’, আর ডাক্তার প্রদ্যোতের কাছে তা হলো ‘অণুজীবের সংক্রমণ’। এই যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক, তাকে গবেষক হিসেবে আমরা জ্ঞানতাত্ত্বিক ছেদ বলতে পারি। প্রদ্যোতের ‘স্টিল-সূঁচ’ বা ইনজেকশন এখানে পাশ্চাত্য আধুনিকতার এক প্রতীকী অস্ত্র, যা জীবন মকিমের হাজার বছরের লালিত দর্শনকে আঘাত করছে। তারাজঙ্কর সুকৌশলে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞান রোগ নিরাময় করলেও মানুষের ‘মৃত্যুদর্শন’কে শাস্ত করতে পারছিল না।

বাংলার গ্রামজীবনে কলেরা বা ওলাউঠা ব্যাধিটি যখন মহামারির রূপ ধারণ করত, তখন মানুষের কাছে তা অণুজীবের চেয়েও বেশি ছিল ‘দেবীর রোষ’। তারাজঙ্করের ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে এই লৌকিক প্রতিক্রিয়ার এক নিবিড় চিত্র পাওয়া যায়, “গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তখন সংকীর্তনের শোরগোল উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মাতব্বর ছিঁরু পাল আসিয়া ডাক্তারকে বাধা দিয়া কহিল — ‘ডাক্তার বাবু, ও লোহার সূঁচ ফোটানো থাক। মড়ক লাগিয়াছে ওলাবিবির রোষে। গ্রামের সীমানায় পূজা দিয়াছি, শাস্তি-স্বস্তায়ন করিয়াছি। দেহের রক্তে যখন মরণ-বিষ নামিয়াছে, তখন ওই ঔষধ দিয়া কি বিধাতার বিধান খড়ানো যায়? ওলাবিবির পূজা না হইলে নিস্তার নাই।’”^{৪৫} এখানে ওলাবিবির পূজা দেওয়া কেবল কুসংস্কার নয়; বরং চরম সংকটে মানুষের এক প্রকার ‘সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষা’। যখন বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে, তখন তারা ধর্মের আশ্রয়ে নিজেদের অসহায়ত্ব ঢাকার চেষ্টা করে। ফুকোর ভাষায়, এটি ছিল ‘Resistance to Biopower’। ডাক্তার যখন ইনজেকশন দিতে চাইছেন, তখন সমাজ তাকে বিজাতীয় বা ‘Aliens’ হিসেবে দেখছে কারণ সেই চিকিৎসার পেছনে কোনো মানবিক বা আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা ছিল না। লৌকিক দেবী এখানে এক প্রকার ‘যুথবন্ধ মানসিক ঢাল’ হিসেবে কাজ করছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি এবং শরৎচন্দ্রের উত্তরকালীন সাহিত্যে আমরা দেখি বিজ্ঞানের এই জয়ের পেছনে থাকা ট্রাজেডিকে। বিজ্ঞান যখন বিশ্বাসকে হারিয়ে দেয়, তখন মানুষের মনে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা গবেষণার এক গভীর দিক, “তস্তি-কবজে যখন কাজ হইল না, তখন গ্রামের মানুষ অবাক হইয়া দেখিল ডাক্তারবাবুর সেই বিজাতীয় জলপড়া (ওষুধ) কাজ করিতেছে। কিন্তু আরোগ্য লাভ করিলেও তাহাদের চোখে-মুখে এক বিষণ্ণতার ছায়া। যেন তাহাদের আজন্ম লালিত দেবতাটি হারিয়া গিয়াছে এক কাঁচের শিশির নিকট। জীবন বাঁচিল সত্য, কিন্তু চিরন্তন বিশ্বাসের বনস্পতিটি মূলে কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইল।”^{৪৬} এই উদ্ভৃতিটি প্রমাণ করে যে, ১৯ ও ২০ শতকের মহামারি বাংলা সাহিত্যে কেবল শারীরিক নিরাময়ের আখ্যান নয়, এটি ছিল এক প্রকার অস্তিত্ববাদী সংকট। বিজ্ঞান মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিলেও তাদের মনস্তাত্ত্বিক আশ্রয়টি কেড়ে নিয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান এখানে একাধারে ‘ত্রাতা’ এবং ‘সংস্কৃতি হরণকারী’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এখন আমরা যে বিষয়টিকে স্পর্শ করব, তাকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বে ‘Realism of the Grotesque’ বা ‘বীভৎস বাস্তববাদ’

বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে এতদিন পর্যন্ত মৃত্যু ছিল করুণ বা রোমান্টিক; কিন্তু জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আধুনিক লেখকরা মহামারি ও মৃত্যুকে এক নগ্ন ও পাশবিক সত্য হিসেবে তুলে ধরলেন।

জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের সেই অনন্য কথাশিল্পী যিনি মানুষের মনের অন্ধকার অলিগলি এবং শরীরের চূড়ান্ত যন্ত্রণাকে কোনো আবরণ ছাড়াই তুলে ধরেছেন। তাঁর আখ্যানে কলেরা কোনো বিমূর্ত শোক নয়, বরং এক পৈশাচিক শারীরিক বিকার, “কলেরার সেই কালরাত্রিতে রোগীর দেহটি আর মানুষের অবয়ব রহিল না। উদরাময় ও বমিতে শরীরটি যেন এক জ্যাস্ত কঙ্কাল। পৈশাচিক আক্ষেপ (Cramp) যখন হাত-পায়ের পেশিগুলোকে মড়াইয়া দিচ্ছিল, তখন তাহার কণ্ঠ হইতে যে গোঙানি বাহির হইতেছিল, তাহাতে কোনো প্রার্থনা ছিল না — ছিল কেবল এক আদিম প্রাণীর যন্ত্রণাময় চিৎকার। শিয়রে বসিয়া স্ত্রী যখন সেই কদর্য ক্রন্দ পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার চোখে তখন শোকের চেয়েও ঘৃণাই ছিল অধিক প্রকট।”^৭ এখানে লক্ষণীয় যে, লেখক ‘শোক’ বা ‘মমতা’র বদলে ‘ঘৃণা’ ও ‘ক্রন্দ’ বা Filthকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গবেষক হিসেবে আমরা একে ‘Aesthetics of the Abject’ বা বর্জনীয় নন্দনতত্ত্ব বলতে পারি। জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন যে, মহামারির চরম পর্যায়ে মানুষের শরীর যখন নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন তার ন্যূনতম মানবিক মর্যাদটুকুও বিলীন হয়ে যায়। সেবা এখানে স্বর্গীয় কোনো কর্ম নয়, বরং এক প্রকার কদর্য বাধ্যবাধকতা। এটি শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীর সেই রোমান্টিক সেবার ধারণাকে আমূল চূর্ণ করে দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যাধি ছিল এক প্রকার ‘জৈবিক ক্রিয়া’। তাঁর লেখনীতে মহামারি বা রোগকে কোনো দৈব অভিষাপ হিসেবে নয়, বরং এক প্রকার শীতল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, “মহামারি আসিয়া গ্রামটাকে যেন ল্যাবরেটরির এক খাঁচায় পরিণত করিয়াছে। যন্ত্রণায় ছটফট করা মানুষগুলো সেখানে কেবল কতগুলো জৈব উপাত্ত (Data)। ডাক্তারের নির্লিপ্ত চোখ আর লেখকের কলম — উভয়ই সমান নির্মম। যখন কেহ মারা যায়, তখন সেখানে কান্নার চেয়েও বড় হইয়া দেখা দেয় ‘জীবাণু’ ছড়াইবার আতঙ্ক। মৃত্যু সেখানে পবিত্রতা হারাইয়া কেবল এক দূষিত বর্জ্যে পরিণত হয়।”^৮ এখানে আমরা ফুকোর সেই চিকিৎসা-দৃষ্টির চরম রূপ দেখি। মানিকের আখ্যানে রোগীকে আর ‘ব্যক্তি’ হিসেবে দেখা হয় না, তাকে দেখা হয় ‘সংক্রমণের আধার’ হিসেবে। এই যে মানুষের ওপর থেকে ‘ব্যক্তিত্ব’ বা ‘Soul’কে সরিয়ে দিয়ে তাকে কেবল একটি ‘Body’ বা শরীরে নামিয়ে আনা — এটিই হলো আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যের নিষ্ঠুর সত্য। গবেষকের পরিভাষায় একে বলা যায় ‘Dehumanization through Disease’।

পূর্ববর্তী সাহিত্যিক পর্বে মৃত্যু ছিল একটি ‘ইভেন্ট’ বা ঘটনা, যা সমাজকে শোকাবৃত্ত করত। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত বা মানিকের যুগে মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল একটি ‘প্রসেস’ বা প্রক্রিয়া, যা সমাজকে আতঙ্কিত ও স্বার্থপর করে তোলে, “শ্মশানের আগুন তখন আর নিভিতেছে না। কিন্তু সেই আগুনের আলোতে কোনো পারলৌকিক পবিত্রতা নাই। আছে কেবল পচা মাংসের উৎকট গন্ধ আর ফেলে আসা ঘরবাড়ির বিজাতীয় নিস্তৃথতা। মানুষ তখন কাঁদতেও ভুলিয়া গিয়াছে; কেবল নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে — সে এখনো জীবিত কি না।”^৯ এই উদ্ভৃতিটি প্রমাণ করে যে, মহামারিকালীন মনস্তত্ত্বে ‘পরার্থপরতা’র চেয়ে ‘আত্মরক্ষা’র আদিম প্রবৃত্তি বড়ো হয়ে ওঠে। এখানে মৃত্যুর কোনো ‘নন্দনতত্ত্ব’ বা বিউটি নেই, আছে কেবল এক নগ্ন এবং বীভৎস ‘বাস্তবতা’।

এখন আমরা দেখব কীভাবে উচ্চবর্ণের সাহিত্য যখন রোগীকে বর্জন করছে, তখন দলিত এবং মতুয়া আন্দোলন ব্যাধিকে কেন্দ্র করে এক নতুন ‘সামাজিক সংহতি’ এবং ‘মানবতাবাদী ধর্মতত্ত্ব’ গড়ে তুলছে। বিশেষ করে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ কীভাবে মহামারিকালীন সেবাকে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করেছিল, তা এই অংশে আলোচিত হবে। মতুয়া আন্দোলন কেবল একটি ধর্মীয় সংস্কার ছিল না, এটি ছিল আত্মের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের এক লৌকিক পথ। যখন বাংলায় কলেরা বা বসন্তের মতো মড়ক আসত, তখন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন — “হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ ছিল — ‘হাতে কাম মুখে নাম’। তিনি বলিতেন, যখন মড়ক আসিবে, তখন পলায়ন করিও না। আতুরকে সেবা করাই পরম ধর্ম। তাঁহার অনুসারীরা জপতপ ছাড়িয়া আত্মের শিয়রে গিয়া দাঁড়াইতেন, কারণ হরিচাঁদ বলিতেন, ‘জীবে দয়া নাম রুচি’ — অর্থাৎ জীবের সেবা ছাড়া হরিনাম বৃথা।”^{১০}

মতুয়া দর্শনে ব্যাধিকে ‘পাপের ফল’ বা ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবে দেখা হয়নি। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এই সেবাকে আরো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি যখন শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের কথা বলেছিলেন, তখন সেটি ছিল এক প্রকার ‘Social Medicine’। উচ্চবর্ণের সমাজ যখন সংক্রমণের ভয়ে নিচু জাতের আক্রান্ত মানুষকে শ্মশানের ধারে ফেলে আসত, তখন মতুয়ারা তাদের আপন করে নিত। গবেষকের দৃষ্টিতে এটি ছিল ‘Alternative Modernity’, যেখানে বিজ্ঞান নয়, বরং ‘ভ্রাতৃত্ববোধ’ ব্যাধি জয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

মালো বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে মহামারি যখন আসে, তখন তার চরিত্র হয় সামষ্টিক। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাসে এই দলিত জীবনের যে মরণপণ লড়াই এঁকেছেন, তা মূলধারার সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। “মালো পাড়ায় ওলাউঠা ঢুকিয়াছে। কাহারো ঘরে অন্ন নাই, কাহারো চোখে ঘুম নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া পলাইল না। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ছড়াইয়া পড়িল মরণ-শীতল ছোঁয়া, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই ছড়াইয়া পড়িল সেবার সংকল্প। ওলাবিবির গানের সুরে সুরে তাহারা একে অপরের কপালে হাত রাখিল। এ মড়ক তাহাদের আলাদা করিতে পারিল না, বরং আরও ঘন করিয়া বাঁধিল।”^{১১} এখানে ‘শুশ্রূষা’ বিষয়টি ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি একটি গোষ্ঠীগত প্রতিরোধ। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় আমরা যেখানে ‘বিচ্ছিন্নতা’ দেখি, মালোদের জীবনে সেখানে আমরা দেখি ‘বৃহৎসংস্রা’। দলিত সাহিত্যে ব্যাধিকে মোকাবিলা করা হয় ‘সাংস্কৃতিক সংহতি’র মাধ্যমে। ওলাবিবির গান এখানে কেবল কুসংস্কার নয়, এটি মানুষের মনোবল টিকিয়ে রাখার এক মাধ্যম — যাকে সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় ‘Collective Psychological Shield’।

আধুনিক দলিত সাহিত্যে মহামারিকে দেখা হয় এক ঐতিহাসিক বঞ্চনার দলিল হিসেবে। উচ্চবর্ণের শুচিবায়ুগ্রস্ততা ব্যাধিকে কীভাবে জাতপাতের হাতিয়ার করে তোলে, তা এখানে স্পষ্ট, “যখন মড়ক আসিত, তখন উচ্চবর্ণের পাড়ায় ডাক্তার আসিত, কিন্তু নমশূদ্র পাড়ায় আসিত কেবল পুলিশের নিষেধাজ্ঞা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই শ্মশানে গিয়া আতের সেবা করিত যাদের ছায়া মাড়াইতে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা ঘৃণা করিত। সেবার সময় আমরা ‘মানুষ’, কিন্তু নিরাময়ের পর আমরা পুনরায় ‘অস্পৃশ্য’ — এই যে নিদারুণ ইতিহাস, তাহা আমাদের রক্তে লিখা আছে।”^{১২} মনোহর মৌলী বিশ্বাসের এই আখ্যানটি গবেষণার একটি বৈপ্লবিক দিক অনাবৃত করে। এটি হলো ‘Politics of Scavenging and Care’। অর্থাৎ, সমাজ যখন চরম বিপদে পড়ে, তখন সেবার বা দাহ করার কঠিন শ্রমটি চাপিয়ে দেওয়া হয় নিম্নবর্ণের ওপর। কিন্তু সেই সংকট মিটে গেলেই পুনরায় অস্পৃশ্যতার পাঁচিল তোলা হয়। এই ‘সুবিধাবাদী সমাজ-মনস্তত্ত্ব’ দলিত সাহিত্যের এক প্রধান অভিযোগ।

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা আখ্যান-সাহিত্যে মহামারি ও শুশ্রূষার যে বিচিত্র অভিযাত্রা আমরা এই দীর্ঘ আলোচনায় নিরীক্ষণ করলাম, তা এক চরম অস্তিত্ববাদী সংকটের দলিল। এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, কলেরা বা ওলাউঠার মতো মড়ক কেবল শরীরী বিনাশের কারণ ছিল না; তা ছিল সমাজ-দেহের গভীরে প্রোথিত সংস্কার, শ্রেণিবিদ্বেষ এবং ক্ষমতার রাজনীতির এক নির্মম উন্মোচক। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’তে যে সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণের সূচনা আমরা দেখেছি, মিশেল ফুকোর ‘বায়োপলিটিক্স’এর আলোকে তা একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিশ্বে আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আমরা দেখেছি, কীভাবে তারাজঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’এ প্রাচীন লৌকিক প্রজ্ঞা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার এক অলঙ্ঘ্য সংঘাত রচিত হয়েছে। এই সংঘাত কেবল দুটি চিকিৎসা পদ্ধতির লড়াই নয়, বরং তা ছিল একটি জাতির আত্মপরিচয় ও জীবনদর্শনের রূপান্তর। অন্যদিকে, জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মোহ ও বীভৎস বাস্তববাদ আমাদের শিখিয়েছে যে, চরম সংকটে মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক শোভনতা কীভাবে অন্তর্হিত হয় এবং কেবল টিকে থাকার পাশবিক প্রবৃত্তিই মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে এই গবেষণার সবচেয়ে আশাপ্রদ দিকটি উন্মোচিত হয়েছে দলিত ও মতুয়া সাহিত্যের পর্যালোচনায়। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ‘হাতে কাম মুখে নাম’ এবং ‘জীবে দয়া’র মন্ত্র মহামারিকে কেন্দ্র করে এক বিকল্প মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলেছিল। যেখানে তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ সংক্রমণের ভয়ে রোগীকে ‘অস্পৃশ্য’ জ্ঞানে ত্যাগ করেছে, সেখানে মতুয়া ও দলিত জনগোষ্ঠীর যুথবদ্ধ শুশ্রূষা এক নতুন ‘সেবা-ধর্মতত্ত্ব’ প্রতিষ্ঠা করেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস-তীরের মালোদের

লড়াই প্রমাণ করেছে যে, ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির সংহতিই মহামারির শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে চিত্রিত এই মহামারির আখ্যানগুলি আমাদের এই ধুব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় যে — ব্যাধি যেমন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, তেমনি তা নতুন এক মানবতার জন্ম দেয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শরীরকে নিরাময় করলেও, মানুষের বিপন্ন আত্মাকে শান্ত করার রসদ জোগায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ১৯ ও ২০ শতকের এই সাহিত্যিক বয়ানগুলি তাই কেবল অতীত নয়, বরং সমকালীন ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য এক চিরস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক দিশারি। ব্যাধির করাল গ্রাসে মানুষের ক্ষুদ্রতা যেমন অনাবৃত হয়েছে, তেমনি শূশ্রূষার মধ্য দিয়ে মানুষের ‘দেবত্ব’ও মহিমাম্বিত হয়েছে। সাহিত্যের এই দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে ব্যাধি-জয়ী অপরাজেয় মানুষের অবিনাশী পথচলা।

তথ্যসূত্র:

- ১। ‘শ্রীকান্ত ১ম পর্ব’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২০
- ২। ওই, পৃ. ৫৪
- ৩। ‘পথের পাঁচালী’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৮
- ৪। ‘আরোগ্য নিকেতন’, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৭২
- ৫। ‘গণদেবতা’, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১২৪
- ৬। ‘বিভূতি-রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪১২
- ৭। ‘জগদীশ গুপ্তের নির্বাচিত গল্প’, জগদীশ গুপ্ত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮৯
- ৮। ‘মানিক-রচনাবলী’ ৩য় খণ্ড, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩১০
- ৯। ‘সতীনাথ গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড, সতীনাথ ভাদুড়ী, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৪
- ১০। ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’, তারকচন্দ্র সরকার, ঠাকুরনগর, শ্রীধাম ওড়াকান্দি মতুয়া মহাসংঘ, ২০০৫, পৃ. ১২৮
- ১১। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৪
- ১২। ‘অমরুতায়ন’, মনোহর মৌলী বিশ্বাস, চতুরঙ্গ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৬

গ্রন্থপঞ্জি:

- জগদীশ গুপ্ত, ‘জগদীশ গুপ্তের নির্বাচিত গল্প’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘শ্রীকান্ত ১ম পর্ব’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯
- তারকচন্দ্র সরকার, ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’, ঠাকুরনগর: শ্রীধাম ওড়াকান্দি মতুয়া মহাসংঘ, ২০০৫
- তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আরোগ্য নিকেতন’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮
- তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গণদেবতা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিভূতি-রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পথের পাঁচালী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মানিক-রচনাবলী’, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
- মনোহর মৌলী বিশ্বাস, ‘অমরুতায়ন’, চতুরঙ্গ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২
- সতীনাথ ভাদুরী, ‘সতীনাথ গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৭৩
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩
- Albert Camus, ‘The Plague’, Translated by Stuart Gilbert, London, Penguin Books, 1948
- Michel Foucault, ‘The Birth of the Clinic’, An Archaeology of Medical Perception, Translated by A. M. Sheridan Smith, London, Routledge, 1973
- Michel Foucault, ‘The History of Sexuality’ Volume 1: An Introduction, Translated by Robert Hurley, New York, Pantheon Books, 1978
- Susan Sontag, ‘Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors’, New York, Farrar, Straus and Giroux